প্রথম

চিত্রা পাল

বিদেশের এক বিরাট মিউজিয়াম। সেখানে কত দেশের কত ধরনের মানুষজন। গাত্রবর্ণও কতরকমের। কেউ কাউকে চেনে না, জানে না। তার মধ্যে এক বয়স্ক বাঙালি মহিলা প্রাণপণে খুঁজে চলেছেন তাঁর চেনা সঙ্গীদের। মিউজিয়ামের গার্ড অচেনা দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। কিছুই বোঝা গেল না। শীতের দেশেও ভয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল মহিলার। এখন এদেশের পুলিশ যদি এসে অনধিকার প্রবেশকারী বলে গ্রেপ্তার করে, তা হলে কী হবে? আতঙ্কে গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ।

দুঃস্বপ্ন নয়। ঠিক এমনই বিপাকে পড়েছিলাম প্রথমবার ইউরোপ সফরে গিয়ে ভ্যাটিকান সিটিতে। আমি কখনও ভাবিইনি যে আমি ইউরোপ যেতে পারব বা যাব। বছর সাত-আট আগেকার কথা। আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে তার নিজের কাজে এসেছিল। আমি স্থায়ী উত্তরবঙ্গবাসী বলে তার কাজের শেষে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমরা আগে বেশ কিছুদিন পরস্পর পাশাপাশি বাড়িতে কাটিয়েছি। পরে সে তার নিজের কলকাতার বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে যায়। তবে যখনই কোনও কাজে এ অঞ্চলে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। এবারেও সেভাবেই এসেছিল। কথায় কথায় আমাকে বলল, ইউরোপ বেড়াতে যাবে? আমি হালকা চালে বললাম, গেলেই হয়। তা, তোমার বর, ছেলে, মেয়ে? আমি যদি যাই, তবে মেয়েটাকে সঙ্গে নেব। ওরা পিতাপুত্র একজনের কর্মজীবন শেষ আর একজনের কর্মজীবন শুরু। ওরা যেতে চাইলে যাবে, না হলে আমরাই চলে যাব।

সেদিন ওই পর্যন্তই কথা হয়েছে। তারপরে আমরা যে যার স্থানে, আর কিছুদিন পরে আমি ভুলেও গিয়েছি। হঠাৎ এক শীতের দুপুরে ওই বন্ধুর ফোন, ইউরোপ যাওয়ার কথা বলেছিলাম, ভুলে গেলে নাকি? আরে দাঁড়াও চিন্তাভাবনা করি? বন্ধু বলল, তোমাকে দু'দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে জানিও।

পরের দিন আমি ওকে ফোন করে জানালাম, ঠিক আছে, যাব, তুমি প্রস্তুতি নাও।

ও বলল, তুমি বলার আগেই আমি নিয়ে ফেলেছি। আমি বললাম, সেকি? আরে যে সংস্থার সঙ্গে যাব, ওরা বলল, এখনই সিট বুক করে নিন, কিছু কনসেশন দেয়া হচ্ছে, তো আমি আমার সঙ্গে তোমারটাও বুক করে দিলাম।

আমি বললাম, যদি না করে দিতাম? বন্ধু বলে, সে দেখা যেত। ওর এই যাওয়ার ব্যাপারের নিশ্চয়তা আমার সব দ্বিধা দূর করে দিল।

এইবার শুরু হল যাওয়ার প্রস্তুতি। কারণ আমরা গরমের দেশের লোক। আর ওদেশে শীতের কামড়ই সবচেয়ে বেশি। সোয়েটার, উইন্ডচিটার, টুপি, মাফলার, উলের মোটা মোজা, পাতলা মোজা — এমন এসব হরেক রকমের শীতবস্ত্রে বাক্সপ্যাঁটরা ভর্তি করে এক শুভদিনে দমদম বিমানবন্দর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ইত্যাদি নানা দেশ ঘুরে ঠাঁই নিলাম সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন নামে এক শহরে। প্যারিস থেকে লুসার্ন মেঘ কুয়াশা, পাহাড়ের পাকদণ্ডি পথের যাত্রা খুব মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের দার্জিলিংকে। দীর্ঘ পথযাত্রা। একসময় আমি সামনের সিট খালি দেখে পিছনের দিক থেকে সামনের সিটে এসে বসে পড়লাম। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। দেখছিলাম, কেমন কালো ফিতের মতো রাস্তা খুলে যাচ্ছে আমার সামনে।

এমন সময়ে হঠাৎ আমার রুমমেট রীতা চিৎকার করে বলে উঠল, প্লিজ, গাড়ি থামাও। শিগগির গাড়ি ঘোরাও। সবাই অবাক। জানা গেল, রীতা আসার সময়ে ভুল করে ওর বিছানার বালিশের তলায় পাসপোর্ট-ভিসা, টাকাপয়সা সমেত ব্যাগটা ফেলে এসেছে। সুদূর বিদেশভ্রমণে পাসপোর্টও ভিসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্র। এখানে আবার যে কোনও জায়গা দিয়ে গাড়ি ঘোরানোর নিয়ম নেই। যেখানে সেখানে ওভারটেকও করা যায় না। পথে চলার যা নির্দেশ পথের পাশে দেওয়া আছে, তাই মেনে চলতে হবে। আমাদের দলের লিডার অবশ্য বাস থেকেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হোটেলে ফোনে যোগাযোগ করলে ওরা বলল, আধঘণ্টা পরে জানাচ্ছে। খানিক পরে ওরা জানাল, ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। লিডার আমাদের পরবর্তী, আস্তানার হদিশ বলে দিল। রাতে হোটেলে পৌঁছে ব্যাগ হাতে পেলে সকলেই স্বস্তি পেলাম।

রীতার পরে যে ঝামেলার পালা আমার তা আগে বুঝিনি। বুঝলাম যখন, তখন আমার কালঘাম ছুটে খাওয়ার অবস্থা। ঘুরতে ঘুরতে আমরা রোম শহরে এসেছি। এখানে এসে কী দেখব আর কী দেখব না, বুঝতে পারছি না। এই ঐতিহ্যবাহী শহরের পথঘাটও গল্প বলে। প্রথমে আমরা সেন্ট পিটার্স চার্চ, ইত্যাদি দেখে গেলাম ভ্যাটিকান মিউজিয়াম। সেখানে দেখলাম সিস্টিন চ্যাপেল আর অবাক করা অসাধারণ সেইসব ছবি যার সৃষ্টিকর্তা মাইকেল এঞ্জেলো। পোপ জুলিয়াস সেকেন্ড চার্চ-এর নেতৃত্বে ইতালিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এইসব পুনর্নির্মাণ করান, পেন্টিং করান।

পার্থিব শিল্পকলায় অপার্থিব অবদান, এত বিস্ময়কর যে তা দেখা, ও দেখে অনুধাবন করা এই সামান্য সময়ে অসম্ভব। দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম বোধ হয়। আমার সঙ্গী-সাথীরা একে একে কখন সরে গিয়েছে, খেয়াল করিনি। এরপরে 'একজিট' লেখা দেখে দেখে বেরিয়ে এসেছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

ওই বিরাট চত্বরে দলে দলে মানবের মিছিলে আমার পরিচিতরা কেউই নেই। লাইন দিয়ে দর্শনার্থী আসছে, সেখানেও বার কয়েক ঘোরাঘুরি করি, না সেখানেও পরিচিত কেউ নেই। কী করব? কান্না পাচ্ছে। শাড়ি পরিহিত আমাকে ওখানে বারবার ঘোরাঘুরি করতে দেখে একজিটের উল্টোদিকে ছোট্ট এক অস্থায়ী পানীয় স্টলের বাংলাদেশি ভাই। আমার দিকে এগিয়ে আসে। তার সাহায্যেই এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে আমার দলের দু'জনকে পেয়ে যাই। তাঁরাও দলছুট হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁরা গুজরাটি আমি বাঙালি।

কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল আমরা একই বাড়ির একই ছাদের তলায় থাকি। দু'জনেই দু'জনের হাত চেপে ধরি। মিসেস লাগু বলেন, আমার কাছে পাসপোর্ট-ভিসা কিছু নেই, কী হবে উপায়। আমার কাছে তবু ব্যাগে পাসপোর্ট, এয়াটিকিট ছিল।

এবার তিনজনে মিলে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করেও আমাদের দলের কাউকে না পেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় একটু বসার জায়গা খুঁজে দেখছি। এমন সময়ে আমার পাশে ইতালি-পুলিশের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। আর পুলিশের পাশ থেকে আমার রুমমেট রীতার গলা 'ওই যে ওরা'। বাংলা বুলি যে কি মধুর তা একেবারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। ডুবন্ত মানুষের কিছু ধরে বেঁচে ওঠার মতো সেদিন রীতার হাত ধরে আবার নিজেকে ফিরে পেলাম। প্রথমবার দেশের বাইরে গিয়ে দলছুট হয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা চিরদিনের মতো মনে গাঁথা হয়ে রইল।

কবিতা

যেন এক টুকরো ভেসে থাকা কাঠ আস্তানার সন্ধানে ভেসে যাচ্ছি

ভাটার টানে
দীপক সাহা

প্রদূষণের দেশে সবুজ কিশলয়ও কাঁদে
অগোছালো বনানীর কোলে —
ক্লান্ত পাখির ডানায় বৃদ্ধ বিকেল
বিদায় নেয়, নতুন সূর্য উঠবে বলে।
সাদা ফুলেরা ফোটে, ঝরেও যায়,
কুড়োনো কথাদের পাই না আর,
সাপটানো নদী বেঁকে বয়ে গেলে
একাকিত্বে কাল কাটে ধ্রুবতারার।
সূর্য ঢলে গেলে বিবস্ত্র ব্যভিচার
পাশ কাটিয়ে প্রতিবাদশূন্য নদী
লক্ষ মুদ্রায় বিক্রি হয় সুযোগ —
শিল্পীর তুলি-ছোঁয়া নগ্ন ছবি।
পথের লগিতে পথ জুড়ে জুড়ে
পরনির্ভররত বাঁকা পথ্‌পথিক,
তবুও, একদিনের লক্ষ্যে চেয়ে —
রচিত হয়ে চলে ব্রাত্য-এপিক।

বীজ
মানসকুমার চিনি

ভালবাসার চাঁদ আকাশে ডুবে গেল
পুরোনো বাড়ির জানালা দিয়ে দেখি
এই সেই মহাসময়ের চিহ্ন
যার অদূরেমৃত্যুর ইশারা।
আমি চন্দ্রাহত হয়ে
যেন এক টুকরো ভেসে থাকা কাঠ
আস্তানার সন্ধানে ভেসে যাচ্ছি
শহর থেকে দূরে ...
তুমি বুঝতে পারলে না
এ জীবনে ছড়িয়ে থাকা বীজ
কখন কীভাবে ফুটে উঠতে পারে
বীজ, অন্ধকার দেখবে বলে
সে অতীত নিয়ে বসে আছে।

ইতিকথা
তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর গভীরে শুয়ে থাকে
কুহেলি রাত
চাষিরা ঘরে ফেরে
ছাতু মুখে দিয়ে
কাল আবার
জমিদারকে দিতে হবে ফসলের অঙ্কুর
না তো জমি চলে যাবে
মার্শালদের হাতে
নাদাপেটা
হাড় বের করা ছেলেটা
খিদের জ্বালায় ছাতিম গাছের নীচে ঘুমোয়
গত রাতে পিশাচেরা এসে
তুলে নিয়ে গেছে রহিমের বউকে
আকাশে মেঘ আর শকুনের খেলা
এরপর হয়তো ছেঁড়া আঁচল থেকে
অঙ্কুরিত হবে নৈবেদ্যের ফুল আর
সেটাই হবে ...
সূর্যোদয়ের উপনয়ন।

দোদুল্যমান তিন দশক
অভিজিৎ দাস

আমি চলে যেতে চাই তোমার কাছে
আমি থেকেও যেতে চাই তোমার কাছে,
আমি নিজেই জানি না কোনটা ঠিক!
দুই দশক ঃ
বেলা শেষ হল বলেই যাওয়ার তাগিদ
কিছুটা মনভোলা পথিকের মতো,
আমার হৃদয় কুরে কুরে খাচ্ছে!
তিন দশক ঃ
আমি চলে যাব বলেই কি এ সব
আমি থেকে যেতে চাই বলেই এত ঝঞ্ঝা,
আমি নিজেই জানি না কোনটা ঠিক!

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক